নিঃসঙ্গতা লিখিত হল অথবা জাদুবাস্তবতার খোঁজ

খোকন বসু

নিঃসঙ্গতা লিখিত হল। লিখলেন ল্যাতিন আমেরিকার কলম্বিয়ান কথা সাহিত্যিক গ্যাবরিয়েল গারসিয়া মারকেজ (গাবো, ৬.৩.১৯২৭—১৭.৪.২০১৪)। লিখলেন সিয়োন আনোস দ্যে সোলেদাদ (One Hundred years of solitude) নিঃসঙ্গতার শতক) সেই ১৯৬৭ সালে। বইটি ১৯৮২ সালে নোবেল পেল। আর সাথে সাথে পেল একটি বুম্ (boom)। সমালোচকেরা হাতে পেলেন জাদু বাস্তবতার (Magic Realism) এক উপকরণ।

উপন্যাসটি লিখিত হল না বলে প্রথমেই এক সংশোধনী আনতে হবে যে, লিখনটি উপন্যাসিত হল। কেননা বিশেষ্য বিশেষণ ও ক্রিয়া পদ নিয়ে কলম্বিয়ান সাহিত্যের একরকম প্রতিস্থাপন যোগ্য ব্লু-প্রিন্ট আছে। আর সেটা উপন্যাসকে জাদুবাস্তবতার মুখোমুখি এনে দিতে কম সাহায্য করেনি। (কিন্তু এই বিশেষ ধরনের টেক্স্ট নিয়ে আলোচনা করা বাস্তবে সম্ভবপর নয়)।

মাকোন্দো। এই নগর গঞ্জটি কোথাও ছিল না, কোথাও নেই। ইতিহাসে নেই, ভূগোলে নেই। তা শুধু নিঃসঙ্গতাতে আছে। কর্নেলের লেফাফাতে আছে, অন্যত্রও বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। মাকোন্দো একটি কল্পনার সম্ভব অথবা সম্ভবের স্বপ্ন। অথবা গোটা একটা মহাদেশ, তার ভেতরে যে কোনো একটা জায়গায় তা সত্যি থাকতে পারে, এটাই তার অমোঘ বাস্তবতা। মাকোন্দো তাই বাস্তব হয়ে উঠল।

নিঃসঙ্গতার শেষ দিকে তাই আমরা দেখলাম সপ্তম প্রজন্ম পেছনে এক টুকরো শুয়োরের মতো লেজ নিয়ে জন্মাল।

নোবেল পাবার পরও তিনি কিছু বললেন, এল কোলোনেল নো তিয়েনে কুইয়েন লে এসক্রিবা (কর্নেলকে কেউ লেফাফা পাঠায় না) তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এও বাহ্য।

হ্যাঁ, জাদুবাস্তবতা নামক অনন্যতার খোঁজ তার কাছে আছে, তবু সাহিত্যের কোনো ফর্মই আকাশ থেকে হঠাৎ পড়ে না। তার একটা পরম্পরা থাকে। আবার তাই বলে পরম্পরা খুঁজতে গিয়ে ইতিহাসের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফসিল-চিহ্ন দেখতে যাবারও সবিশেষ প্রয়োজন নেই। সাহিত্য বা যাবতীয় সুচারু শিল্পের অস্তিত্বের প্রথম শর্ত হচ্ছে তার ভেতরকার প্রতিসাম্য (equilibrium) ও সামঞ্জস্যতা (harmony)।

একটা লম্বা লাইন দিয়ে বরং সাহিত্যের সন্নিপাত বুঝতে পারলে তবেই জাদুবাস্তবতা স্পষ্ট হয়। আমাদের দেশের অনেক মানুষজন জাদু বাস্তবতাকে খুব সহজ এক প্রতিবেদন বলে মনে করে থাকেন। কোনো গল্পের ভেতরে যদি কোথাও একবারে মা বলে থাকেন, বাছা, তোকে কি কেউ মামাবাড়ি নিয়ে যাচ্ছে না, তবে তুই গাছকে গিয়ে বল্, গাছ, গাছ, আমরা কবে মামাবাড়ি যাব। দেখবি কেউ তোকে ঠিক মামাবাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, ব্যস্,

ওমান শাকে তা নিখুঁত জাদুবাস্তবতা হয়ে গেল, আর তা নাকি আমাদের দেশে অনেক যুগ ধরেই আছে!!

অথচ তিনি কিন্তু দেখাচ্ছেন একটি কাচের টুকরো। উলিসেম কোনো কাচ ছুঁলেই তা অনবরত রঙ বদল করতে থাকছে। ঘটনা তো আর সত্যি সত্যি ঘটে না, তবু তিনি তার মা-কে দিয়ে বলান, কাহিনীর ভেতরে, মেয়েটি কে, শুনি, ...এসব ঘটে যখন তুমি শুধু একজনের প্রেমে পড়ো, এটাই জাদুবাস্তবতা। কাচের রঙ বদলায় না, মনের রঙ বদলায়। বদলানোর দিকটা লক্ষ করো।

কিন্তু তিনি নিজে যে বলেন, প্রেমের অভিজ্ঞান বোঝাতে অনেক রকম অভিব্যক্তিই দেখানো হয়েছে, আমি অন্য ভাবে কিছু বলতে চাইছিলাম মাত্র, আর সেভাবেই এই কাচ ও তার রঙ পালটাবার কথা আমার লেখায় এল, আর কিছু নয়। তিনি নিজে বলেননি, এটা জাদুবাস্তবতা।

তবে মারকেজ বড়ো বিষম উপায়ে কথিত জাদুবাস্তবতায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। নোবেল ভাষণ ১৯৮২ দিতে গিয়ে তিনি যেমন টমাস মান-এর Tonio kroger-য়ের কথা উল্লেখ করেছেন (বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক টমাস মান ১৯০৩ সালে একটি ছোট উপন্যাস প্রকাশ করেন আর তার প্রধান চরিত্রের নামে বইটির নাম দেন Tonio kroger) তেমনি তার গুরু হিসাবে উইলিয়ম ফকনারের নামও করেছেন। ফকনার নিজে কিন্তু বারবার যোশেফ কনরাডের নাম করতেন। কনরাডের একটা কল্পিত নগর ছিল। তার নাম কোসতাগুয়ানা। এটাও ল্যাতিন আমেরিকান একটা নগরগঞ্জ। অনেকে মনে করেন গুয়ানা আর কোসতারিয়া মিলিয়ে মিশিয়ে নামটি আসতে পারে এবং কনরাড প্রকৃত প্রস্তাবে পোল্যানডের মানুষ, ইংরেজি শিখেছিলেন ইংরেজদের মতো করেই, উপনিবেশের মানুষদের ধরণে নয়, অর্থাৎ ভারতীয় ধরনের ইংরেজি লেখকদের মতো তা তিনি শেখেননি, সেই তিনি কৃষ্ণ আফ্রিকান আর ল্যাতিন আমেরিকান উপনিবেশগুলির যন্ত্রণার কথা যেভাবে লেখেন, তাকে অনুসরণ করেন ফকনার। তাতে বলা যায় পরোক্ষে কনরাডের লেখার ধারা না হোক তার চিন্তার প্রভাব মারকেজের অভিব্যক্তির সাথে পরোক্ষে মিশে যায়। কনরাড ও ফকনার দুজনেই কিন্তু বিশেষভাবে শোষিত নিপীড়িত মানুষদের কথা তাদের কাহিনীর ভেতরে বারেবারে এনেছেন। বিশেষত কনরাড তো এই কাজের জন্য অতি পরিচিত ছিলেন। তার লেখা Heart of Darkness উপন্যাসটি এখনো আমাদের ভাবায়।

আমরা যদি ল্যাতিন আমেরিকান সাহিত্যের দিকে ফিরে তাকাই তবে দেখতে পাব সারি সারি উজ্জ্বল রত্নের মতো সব নাম। গাবরিয়েল গারসিয়া মারকেজ একবার বলে ছিলেন, আমরা সকলে (হুয়ান রুলফো/হোরহে লুইস হোরহেস/আলেহো কারপেনতিয়ের/লোজামা লিমা/হুলিও কোরতাজার/ মারিও ভারগাস ওসা/প্রমুখ) ল্যাতিন আমেরিকান কথাশিল্পীরা মিলে সারা মহাদেশকে পটভূমিতে রেখে একটাই উপন্যাস লিখে যাচ্ছি, যার একেকটা অধ্যায় হল আমাদের একেকটা উপন্যাস। আর হুয়ান রুলফো, যাকে ল্যাতিন আমেরিকান সাহিত্যিকদের অনেকেই তাদের গুরু বলে মানেন, তিনি কিনা জীবনে মাত্র

একটাই উপন্যাস লিখে ছিলেন। নায়কের নামে সেই উপন্যাসটির নাম পেদরো পারামো।

এভাবে হুয়ান রুলফো (Yuan/Juan Rulfo, ১৬.৫.১৯১৭—৭.৮.১৯৮৬) লিখেছিলেন অলস কাঠামোর ওপরে স্থাপিত ভূতগ্রস্ত এক নগরগঞ্জের কথা। কোমালা সত্যি সত্যি নেই, বাস্তবে নেই। কোমালা তবু আছে, স্বপ্নের ভেতরে আছে, কল্পনার ভেতরে আছে। ভূতগ্রস্ততার ভেতরে আছে। জাদুবাস্তবতার অনুষঙ্গ হিশাবে কল্পনাসঞ্জাত জাদুনগরীদের কথা বারবার উঠে এসেছে বিভিন্নজনের সাহিত্যকৃতিতে।

তারপর তা আরও গড়াতে গড়াতে যেন এগিয়ে গিয়েছে বাস্তবতার একটা জাদুকাহিনির দিকে। লোকের মুখে মুখে ম্যাজিক রিয়ালিজম জ্যান্ত মিথ হয়ে উঠেছে।

লেখক	জাতিসত্তা	ম্যাজিক নগর
কনরাড	পোলিশ	কোসতাগুয়ানা
রুলফো	মেহিকান	কোমালা
এঙগুগি	কেনিয়ান	ইলমোরোগ
মারকেজ	কলম্বিয়ান	মাকোন্দো

উচ্চারণ যখন নিষিদ্ধ, প্রকাশ তখন ভিন্নতর অভিব্যক্তির আশ্রয় খোঁজে। জন্মলগ্ন থেকেই সরকারি (শাসকদলের) ভাষা আর সাহিত্যের (সংযোগের) ভাষার মাধ্যম আলাদা আলাদা। শাসকদলের সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী ও আধিপত্যকামী ভাষার বদলে সাহিত্যের ভাষা ভিন্ন উচ্চারণ সৃষ্টি করে। তার আঙ্গিকও চিরাচরিত চর্চার পরিবর্তে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। সেই উচ্চারণের নাম মাকোন্দোর গ্রামে হলুদ প্রজাপতির ওড়াওড়ি। সাহিত্যের ভাষা তাই বিভিন্ন রকমেরও হয়ে থাকে।

আর তখন বহুমুখিন বাঙ্ময়তাকে আড়াল দিতে তাকে মনোলিথিক অস্ত্রে দেগে দিতে চায় শাসক পক্ষের দালালেরা। উচ্চারণের বিধ্বংসী ক্ষমতাকে তারা প্রচ্ছন্ন করে দিতে চায়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় ধুঁকতে ধুঁকতে ক্ষয় হতে থাকা গোটা একটা দেনাগ্রস্ত মহাদেশ, দুর্নীতি দুষ্কৃতি নারীদেহ ড্রাগ মাফিয়া চোরাচালান সন্ত্রাস ব্যক্তি হত্যা একদা সোনার লোভ কলাবাগানে গণহত্যা (১৯২৮) অসহয়তা প্রবঞ্চনা নিপীড়ন দারিদ্র বিপ্লবের নামে রগড় আর রক্তপাত। সান্নিপাতিক জ্বরের ঘোরে ভুল বকা এক মহাদেশ। আর মারকেজ সেখানে আরও যোগ করে দিলেন গোঁফ গিটার আর গান (gun/বন্দুক)। সবটাই যেন কর্নেলের লেখাফার গল্পের প্রথম দৃশ্যটি, কফির কৌটোতে পড়ে আছে তলানিটুকু যা চেঁছে তুলতে গেলে চামচে উঠে আসে জঙের (rust) গুঁড়ো। তখন সব কিছুকেই একটা ism-এর নামে দাগ দিয়ে দেওয়াটা এক পরিত্রাণ।

খুঁটিনাটি তথ্য ছাড়া জাদু হয়না। মারকেজ নিজে একবার বলে ছিলেন সেই কথা। তথ্যটাই তো ভয়ঙ্কর বাস্তব। তথ্য কল্পনা আর সময় ট্রিপল হেলিকসের মতো পরস্পর জড়াজড়ি করে পেঁচিয়ে থাকে। তার একটি গল্প মনে করুন। সমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে যখন কলম্বাসের রণতরী তখন তার পাশেই এসে দাঁড়ায় মার্কিন ফ্রিগেট। সম্ভবত সেরকম একটি শব্দবন্ধের নামও হতে পারে ম্যাজিক রিয়ালিজম। মনে হয় কাহিনি থেকে দুচার লাইনের

অংশ বিশেষ খুঁজে খুঁজে নয়, ম্যাজিক রিয়ালিজমকে খুঁজতে হবে কাহিনির সমগ্রতার ভেতরেই।

মারকেজ যদি সাইমন বলিভারের অনুসন্ধান না করতেন তবে এই সতর্ক ভাষা তৈরি হত না। দ্য জেনারেল ইন হিজ ল্যাবেরিনথ বা দ্য আর্টস অব প্যাটিয়ার্ক পড়তে বসলে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য না করে পারা যাবে না, তা হচ্ছে অকতোভিও পাজের সাথে তার পরম আত্মীয়তার কথা। পাজ লিখেছিলেন সেনাধিনায়কের নিঃসঙ্গতা ও তার ভুলভুলাইয়ার কথা। নিজের জীবনটা যে সেনাধিনায়ক নিজের স্বপ্নের বেড়াজালের ভেতরে কাটিয়ে দিলেন তিনি তো ইতিহাসের সত্য। আর তাই মারকেজের কথার বুননও সত্য।

অপ্রসঙ্গত বলা যায় বিশ্বখ্যাত কবি পাবলো নেরুদা লিখেছিলেন তার এক অতি বিখ্যাত কবিতা, বলিভারের জন্য গান (১৯৪১)। কবিতাটির শেষের দিকের পংক্তিতে আছে বলিভারের সেই উচ্চকৃত ঘোষণা, প্রতি একশ বছর পর পর আমি জেগে উঠি আবার যখন জেগে ওঠে জনগণ। একশ বছরের নিঃসঙ্গতা তখন কেটে যায়।

অচেনা সব পথে রিয়ালিজমের খোঁজ নিতে শুরু করেন মারকেজ স্বয়ং তার Chronical of a Death Foretold থেকেই।

ঊনবিংশ শতকে (১৮০০+) জন্ম নেয় রিয়ালিজমের আন্দোলন। রিয়ালিজম মানে ফোটো ফিনিশ বাস্তব নয়। চলমান সমাজকে ওপর থেকে নিচ থেকে পাশ থেকে ধরবার তা একটা আয়না যা সমাজের অসুখগুলিকে তুলে ধরবার একটা প্রচেষ্টা নেয়।

কিন্তু ১৯৪৮ এর ভেতরেই সমালোচনামূলক এই বাস্তববাদ ইওরোপে গভীর সংকটে ডুবে যায়। বাস্তবতাবাদ (objectivity) ক্রমাগত প্রকৃতিবাদের (subjectivity) চেহারা নিতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর (১৯০০+) শুরু হতে না হতে রিয়ালিজমের ধারণা অন্যভাবে ভাবা শুরু হয়ে যায়। আয়নাকে উত্তল (convex) অবতল (concave) বানিয়ে যেমন রিয়ালিটিকে ডিসটরটেড (বিকৃত) করা যায় তেমনি সামাজিক রিয়ালিটির আয়নাও বাস্তবকে বিকৃত করতে থাকে। এই ধরনের রিয়ালিটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আসে রিপোর্টাজ রিয়ালিজম/লোয়ার ডেপথ রিয়ালিজম/সাইকো রিয়ালিজম/ডার্টি রিয়ালিজম/ক্রনিক্যাল রিয়ালিজম/ইত্যাদি। সবই সাময়িক ব্যাপার স্যাপার। এখানে বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা নেই।

১৯২৫ সালে ফ্রানৎজ রো-র একটি বই প্রকাশ হল। শিল্পকৃতির ওপরে একটা সমালোচনার বই। বেশ বড়ো নাম। তখনো পুরানো দিনের ঐতিহ্য/গতানুগতিকতা বহন করে অনেকে বইয়ের বেশ বড়ো বড়ো নামকরণ করে থাকতেন। After Expressionism, Magical Realism, Problem of the Newest European Paintings ছিল সেই বইটির নাম। বইটির একটি স্প্যানিশ সংস্করণ বেশ তাড়াতাড়ি সেই ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়ে গেল। স্প্যানিশ ভাষায় শব্দবন্ধটি হল ম্যাজিসার রেয়ালিশমুস।

লক্ষ করলে বোঝা যাবে ম্যাজিকাল রিয়ালিজম বা ম্যাজিশার রেয়ালিশমুস শব্দবন্ধটি তাহলে নতুন নয় (তবে সবই ব্যাদে/বেদে আছে ধরণেরও নয়) ব্যবহৃত হয়েছে সেই

কতোদিন আগে, প্রায় একশ বছর হতে চলল। আর এই সময়টাই কিনা মারকেজের জন্ম সাল!!

জার্মান শিল্প সমালোচনার একটি বই থেকে শব্দবন্ধ ধার করে কিউবার আলেহা কারপেনতিয়ের সেই ১৯৪৯ সালে ল্যাতিন আমেরিকান সাহিত্যে বাস্তবতা ও ফ্যানটাসির মেলামেশা বোঝাতে মেহিকান বাস্তবতার জাদু শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি যখন হাইতি যান তখন তিনি সূচনা করেছিলেন এই শব্দবন্ধটির, লো রেয়াল মারভিঝোসো বা অবাক বাস্তব। সঙ্গে আরেকটি শব্দবন্ধও প্রচারিত হয়ে ছিল, এল্ রেয়ালিসো মাহিকো বা মেহিকোর বাস্তবতা।

সিয়োন আনোস দ্যে সোলেদাদ (নিঃসঙ্গতার শতক)-এর ভেতরে এক আশ্চর্য ও অনন্য অনুভূতি ছড়িয়ে থাকে যার ফলে যাবতীয় মেটাফর মাইথোলজি ওরাল ন্যারেটিভ ইত্যাদি আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক কুসংস্কারের পরম্পরা যেন পাঠকদের হাইজ্যাক করে রাখে। রূপক কুহক মায়ার বৃত্তে জড়িয়ে থাকে জাল। পাশ্চাত্য সমালোচকরা মনোলিথিক/ মনোগথিক ছাঁচে তাকে চেঁছে তোলেন এবং ১৯২৫-২৭য়ের বিস্মৃতি থেকে তুলে আনা সেই শব্দবন্ধটির পুনঃব্যবহার করেন। অতিদ্রুত তা ম্যাজিক রিয়ালিজম নামেই সর্বপরিচিতি লাভ করে। এক্ষেত্রে, ফ্যানটাস ম্যাজেরিয়া শব্দবন্ধটিও কেউ কেউ ব্যবহার করে থাকেন।

চলমান কল্পনা ও তথ্যনিষ্ঠ বাস্তব যেন তার স্বপ্নময় সময়ের সুতোতে গাঁথা হয়ে যায়। আর কে না জানে স্বপ্ন তো আসলে বিপ্লবী রূপান্তরেরই নাম।

জাদু বাস্তবতা নিশ্চিত নিক্তিতে মেপে নেবার একটা পদ্ধতি নয় যে ছাঁচে ফেলে তাকে মেপে নেওয়া যাবে। তার জন্য আমাদের ইতিউতি প্রাসঙ্গিক খোঁজখবর অবশ্য নিতে হবে।

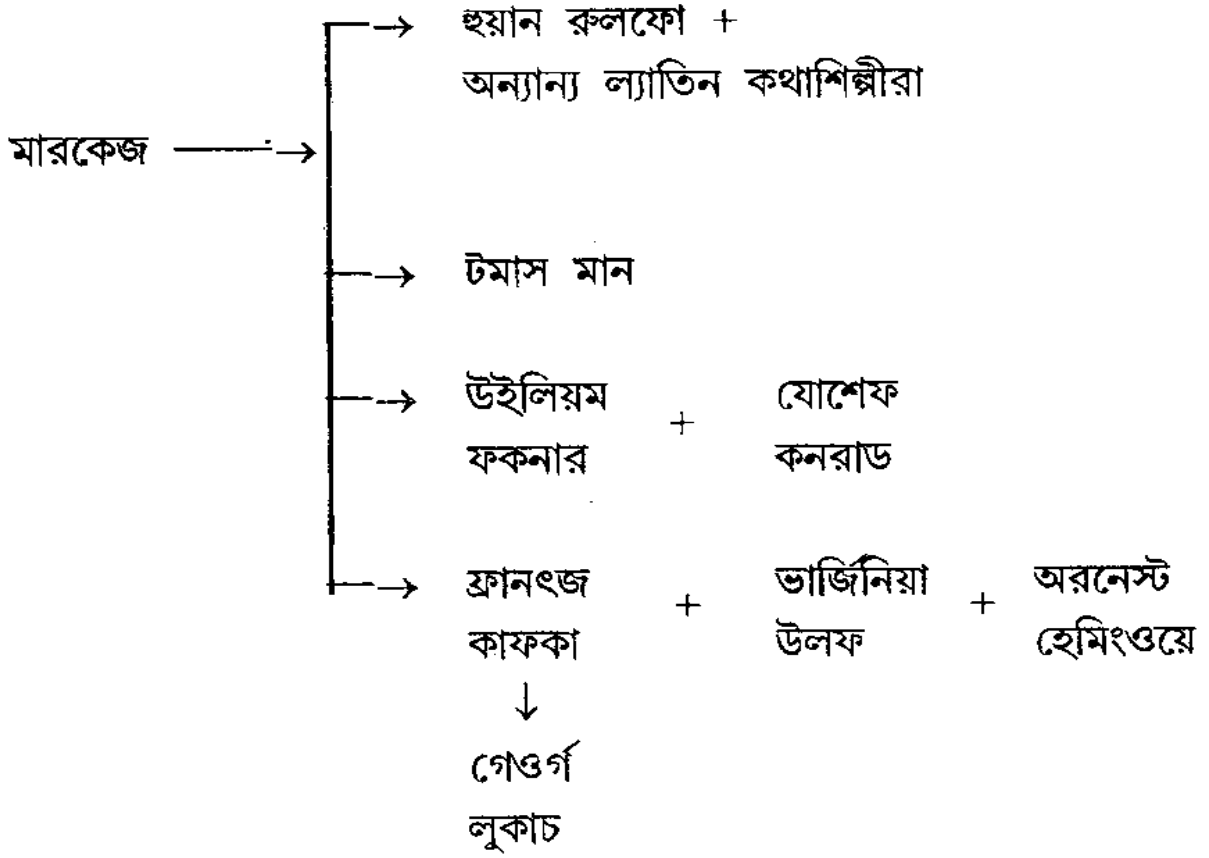

আমরা এবার তাকাই ফ্রানৎজ কাফকার (চেক ইহুদি/যক্ষ্মারোগে অকালে মারা যান) বহুল খ্যাত মেটামরফোসিসের দিকে। মারকেজ তিনখণ্ডে যে আত্মজীবনী লিখবেন ভেবে ছিলেন তার প্রথম খণ্ডটি ভিভির পারা কোনতারলা (কথা বলবার জন্য বাঁচা)-তে আমরা মেটামরফোসিসের স্প্যানিশ অনুবাদ পড়বার পর মারকেজ যে কিরকম উত্তেজিত ছিলেন, রাতের পর রাত ঘুমুতে পারেননি, সেকথা জানতে পাই। ব্যাপারটি মারকেজকে খুবই মুগ্ধ করেছিল।

—একদিন সকালবেলা স্বপ্নভাঙা ঘুম থেকে জেগে উঠলেন গ্রেগর জামজা। আবিষ্কার করলেন তিনি একটি বিরাট পোকায় পরিণত হয়ে গিয়েছেন।

কী ভীষণ উত্তেজিত ছিলেন মারকেজ! বিচ্ছিন্নতার এক উদোম স্বর্গে যেন তার বসবাস করবার অদম্য ইচ্ছা হল। টাইপ রাইটারের সামনে বসে গেলেন যদি এরকম কিছু একটা তিনিও লিখে উঠতে পারেন! নিঃসঙ্গ শতকের শুরু হয়েছিল এরকম একটা ছোবলবাক্য দিয়ে।

কিন্তু কাফকার মেটামরফেসিস সম্বন্ধে গেওর্গ লুকাচ (যিনি ২১.৩.১৯১৯ থেকে ১.৮.১৯১৯ পর্যন্ত মাত্র ১৩৩ দিনের হাঙ্গেরিয়ান সোভিয়েতের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এবং সাহিত্য সমালোচক হিসাবেও যিনি প্রখ্যাত ছিলেন) কি বলছেন? তার মতে, কাফকা সমগ্রতার বদলে পারসপেকটিভিজম বা পরিপ্রেক্ষিতবাদকে তুলে ধরে ছিলেন। সেটা এমন একটা পদ্ধতি যা কোনো তথ্য বা ঘটনাকে সমগ্রের সঙ্গে জৈবিকভাবে আত্মপদী করবার চেষ্টা করে, উপরি স্তরের প্রক্রিয়াকে পুঙ্খানু করে, কিন্তু বিকাশের চালিকাশক্তিকে পরিস্ফুট করে না।

বিপরীত পক্ষে, বের্টোল্ট ব্রেখট (বিশ্বখ্যাত জার্মান নাট্য ও তত্ত্ব ব্যক্তিত্ব) জোর দিয়েছিলেন এম্প্যাথি বা হৃদয়বৃত্তি দিয়ে অনুভব করা ও অনন্বয়ের (Alienation) দ্বান্দ্বিকতার পক্ষে।

বাস্তবতাবাদ (Objectivity) ও প্রকৃতিবাদ (Subjectvity) এই দুইয়ের ভেতরে বিভাজনরেখার নাম হচ্ছে আধুনিকতা। আধুনিকতাকে যারা বাদ দিতে চান প্রকৃতপক্ষে তারা সাবজেকটিভিটির শরিক হয়ে পড়েন। অপ্রাসঙ্গিক দিকে আমরা আর বেশি দূর যাব না।

সুতরাং খোঁজ করতে করতে এতো দূরে এসে আমরা আরও একটা নাম পেলাম, তার প্রখ্যাত সাহিত্যকৃতি, পাশ্চাত্য দেশের কাহিনি। আনুষঙ্গিক ভাবে কাফকার সাথে আসেন অরনেস্ট হেমিংওয়ে এবং আরও আসেন ভার্জিনিয়া উলফ। আসেন না, মারকেজই বরং প্রসঙ্গ তুলে তাদের নিয়ে আসেন। ভার্জিনিয়া উলফের মিসেস ড্যালোয়ের চরিত্রকে অবলম্বন করে তিনি লা হিরাফা শিরোনামে দৈনিক কাগজে কলামও লিখতে থাকেন। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে তিনি কখনোই এক জায়গায় পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন না। ব্যাপক সাহিত্যপট ঘুরে আসেন। শতকের নিঃসঙ্গতাকে ছাড়াতে গেলে কোনো কিছুই বাদ রেখে এগুনো যায় না। (আমরা তার সিনেমা ও সাংবাদিকতা নিয়ে পরে আলোচনা রাখব)।

অরনেস্ট হেমিংওয়ে (পাপা)-র দুনিয়া কাঁপানো বইটির নাম 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যানড দ্য সি' (১৯৫২)। ওল্ডম্যানের ঘটনাস্থল কোজিমার জেলেপাড়া। সেখানে তিনদিন ধরে বিরাট একটা সার্লিন মাছের সঙ্গে যুঝে যাচ্ছে বুড়ো সানতিয়াগো। সানতিয়াগো কি সত্যি মানুষ, এক বৃদ্ধ জেলে? হতেও পারে যে সানতিয়াগো পুইগ, এক বৃদ্ধ জেলে, কুবার একদম প্রথম দিকে তার সঙ্গে দেখা হয় পাপার। সানতিয়াগোর সার্লিনটিকে প্রথম যে হাঙরটি আক্রমণ করে সেই দেনওসো (স্প্যানিশ শব্দ) সম্বন্ধে হেমিংওয়ে বলেন, অসম্ভব ক্ষিপ্র, সাংঘাতিক জীবনীশক্তি আর দারুণ বুদ্ধিমান, সার্লিনের চেয়েও উঁচুতে লাফাতে পারে। এক অসম সংঘাত ঠিক ক্যারিবিয়ন সাগরের মতো।

লেখক	জাতিসত্তা
আলেহো কারপেনতিয়ের	কুবা
কারলোস ফুয়েনতেস	মেহিকো
ফেলিস বের্তো এরনানদেশ	উরুগুয়ে
মিগেল আনহেল আসতুরিয়াস	গুয়েতেমালা
মারিও ভারগাস ওসা	পেরু
রোবেরতো বোলানিও	চিলে
হুলিও কোরতাজার	আরহেন্তিনা
পাবলো নেরুদা	চিলে
গ্যাবরিয়েল গারসিয়া মারকেজ	কোলমবিয়া

জাদুবাস্তবতার স্ফূরণের উপপাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রসঙ্গ দারুণ ভাবে জড়িয়ে আছে। কল্পনার একটি গঞ্জ বা গ্রাম্যনগরী (বাণিজ্য পুজি কেন্দ্রিক নগর/ভোগ পুজির নগর/সামন্ত অবশিষ্ট নগর) পাশাপাশি কাহিনির ভেতরে উঠে আসে। তাদের নাম মাকোন্দো কোমালা ইলমোরোগ কোসতাগুয়ানা কোজিমার, যা খুশি হতে পারে। এই গঞ্জ বাস্তবে থাকে না, তা সত্যি। তবু অকালেই বোঝা যায় যে ল্যাতিন মহাদেশের যে কোনো জায়গাতেই থাকতে পারে তাদের অস্তিত্ব। কাল্পনিক অবস্থান বা নান্দনিক রূপ এভাবে যেন সামাজিক অস্তিত্বে পরিণত হয়। লেখকের মাকোন্দো তখন শুধু শতাব্দীর নিঃসঙ্গতার ভেতরে থাকে না এমনকি কর্নেলের লেফাফা ও অন্যান্য নানা রচনার ভেতরে তাকে গড়ে উঠতে দেখা যায়। তাই তার লেখার ভেতরে মাকোন্দো যত্রতত্র পাত্র হয়ে যেতে পারে। এটা সেই ধারাবাহিক অনিবার্যতার ভিন্ন একটি প্রত্নপ্রকাশ।

যেন অনন্তকাল ধরে বয়ে যায় সেই এক সময়। পনেরো বছর ধরে একই শুক্কুরবার, পনেরো বছর ধরে একই জাহাজঘাটা, পনেরো বছর ধরে পেনসান গ্রানট হবার সেই অর্ডার লেফাফা আর আসেই না। পনেরো বছর ধরে একটু একটু করে জমে ওঠা সাপ্তাহিক আশা শুক্রবারে হাজাজঘাটাতে এসে নিভে যায়। তারপর থেকেই আবার একটু একটু করে জমে উঠতে থাকে প্রত্যাশা। এই অদম্য মনোবলেই ল্যাতিন আমেরিকার ভাষা উচ্চারণ।

এভাবে ঠিক জানা হয়ে যায় মাকোন্দোর বিশেষ জাদুবাস্তবতাকে। আর পনেরো বছর ধরে যার জন্য পেনসান অর্ডারের লেফাফা আসে না সেই মাকোন্দোর কর্নেলকেও। কর্নেলের এখানে নাম নেই। তার নাম থাকবারও প্রয়োজন নেই।

কেননা মাকোন্দোতে বহু বছর বাদে একজন মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটল। তারপর নিরীহ শোকমিছিলের যাত্রাপথ নিয়ে নিষেধাজ্ঞা। তারপর প্রতিদিন নৈশ সিনেমা শোয়ের আগে সেনসর-কর্তা জানিয়ে দেন, সিনেমা দেখা যাবে না, নিষেধাজ্ঞার তুরী বাজল। আবার রাত নামলে কারফিউয়ের দৈনন্দিন সাইরেন। তারপর ঠিক কর্নেলের জন্য পেনসান অর্ডারের লেফাফা না আসার মতো জানা যায় নির্বাচনের আর কোনো আশাই নেই। তার ভেতরে শাসকদলের সাথে সহাবস্থান করে ঠিকাদার স্যারাস। মাকোন্দো খুব পরিচি তার অবস্থান ও অস্তিত্ব খুঁজে দেখবার আর প্রয়োজন হয় না। বাস্তবতার জাদুকে যেন এভাবে চেনা যায়।

আর তার ভেতরেই কাজ করে সব মেসতিসো মুলাতো নেগ্রিটো কংকুইসতোর পোরলাসিওনেস (অল্প রোজগেরে গরিবগুর্বো) আর একটুকরো চিরকূট নিয়ে কাম্পানিয়নরা (কমরেডরা)। এই নগরগঞ্জের নাম মাকোন্দো।

—আমি প্রত্যাশা করি আগামি দিনের কল্পনায় এমন একটা রাষ্ট্র গড়ে উঠবে যেখানে কারুর বাঁচা-মরা অন্তত অন্যের নির্দেশে স্থিরীকৃত হবে না। এটাই বিষণ্ণ বিপন্ন নিঃসঙ্গ শতকের শেষ কাঙ্ক্ষিত আপ্তবাক্য।

পরিশিষ্ট। একটু যেন খুঁতখুঁত রয়ে গেল। চিলের সাহিত্যিক রোবরতো বোলানিও যখন বলছেন, মারকেজ এভাবে জাদু-বাস্তবতা নিয়ে ব্যস্ততা শুরু করে দেওয়াতে কথাসাহিত্যের ভেতরের প্রকৃত বাস্তবতা যেন আড়ালে চলে গেল।